:: ষষ্ঠদশ অন্তর্জাল সংখ্যা ::

৭ই শ্রাবণ, ১৪২৮/ 24.07.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
“স্মৃতিচারণের” স্মৃতি	সুনন্দন ঘোষ
পার্থসারথির জন্মদিনে	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার স্থায়ী সুর	শ্রী তুফান চক্রবর্তী
গুরু নানকের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
না বলতে নেই	শ্রী দীপঙ্কর নন্দী
এবার দাঁড়াতে দাও	শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য
খেলার সাথী	শ্রীলা মৈত্র

DO NOT COPY

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

প্রীতি-কণা

"জীবনে দুঃখ কষ্ট থেকে ভয় পেও না। অন্ধকারের ভিতরেও মণি মাণিক্য থাকে। দুঃখ কষ্ট জীবনে অভিজ্ঞতা এনে দেয়, ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়তে সহায়তা করে। দুঃখ কষ্ট ও ব্যথায় তুমি ঋজু হও, দৃঢ় হও। সত্যের উপর ভিত্তি করে আরও সোজা হয়ে দাঁড়াও। তোমার পুরুষাকারকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের কৃপা লাভ কর।"

DO NOT COPY

“স্মৃতিচারণের” স্মৃতি

সুনন্দন ঘোষ

পার্থসারথির প্রাণপুরুষ শ্রী প্রীতিকুমারের সহধর্মিণী শ্রীমতী শুক্লা ঘোষের কিছু লেখা পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের আগ্রহে। শ্রীপ্রীতিকুমারের আমলে সেই যুগের অনেক বিদগ্ধ লেখকের রচনা প্রকাশিত হয়েছে পার্থসারথির বিভিন্ন সংখ্যায়। দুষ্প্রাপ্য কিছু মূল্যবান লেখা অন্তর্জাল পত্রিকার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সর্বজনের নাগালে এনে দেবার প্রচেষ্টা শুরু করেছি আমরা।

যশস্বী লেখকদের সমাজ-শিক্ষা-ধর্মাচরণ-বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ, যা সমকালীন যুগে ছিল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, আজ তাদের প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। ১৯৭১ এর জনপ্রিয় রচনা ২০২১ এর পাঠককে আকৃষ্ট করবে না এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিল্প বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব পরিবর্তন হয়েছে। বদল এসেছে সামাজিক অর্থনৈতিক ভাবনায়। একই সত্য প্রযোজ্য শ্রীমতী শুক্লা ঘোষের “স্মৃতিচারণের” ক্ষেত্রেও। কুড়ি তিরিশ বছর আগে যে কুশীলবদের নিয়ে স্মৃতিচারণের পর্যায়গুলি বিন্যস্ত হয়েছে, তাঁরা কেউ এখন ইহলোকে অতি-বার্দ্ধক্যে কাতর, কেউ পরলোকে, দেনা-পাওনার হিসেবের বাইরে। তাই অতীতের সঞ্চয় থেকে নির্বাচিত কিছু লেখা নতুন দিনের পাঠকের হাতে পৌঁছে দেবো আমরা।

জন্মলগ্ন থেকেই পার্থসারথি ছোট পত্রিকা - লিটল ম্যাগাজিন। এর পাঠকেরা বরাবরই খুব নিবেদিতপ্রাণ। প্রজন্ম বদলায়, সমাজের চরিত্র বদলায়, কিন্তু পার্থসারথির পাঠকের আন্তরিকতা বদলায় না। এটা গত সাড়ে তিন দশক ধরে আমার কাছে খুব বিস্ময়ের। এই পত্রিকায় রাজনীতির খবর নেই, খেলার পৃষ্ঠা নেই, সিনেমার আলোচনা নেই। তবু সব যুগেই একদল পাঠক-পাঠিকা এই পত্রিকার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন। পত্রিকা যখন মুদ্রিত হতো, তখন কেউ কেউ তাদের মতামত, চিন্তা ভাবনা, সমালোচনা পৌঁছে দিতেন টেলিফোনের মাধ্যমে, পোস্ট কার্ডে, খামে। তাঁদের বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ হতো পার্থসারথিতে। এ যুগে লেখা এবং মতামত আসে ই-মেইলে, মেসেজে, হোয়াটসয়্যাপে। চেনা মানুষ, অচেনা মানুষদের স্পন্দন অনুভব করতে ভাল লাগে।

বাবার সময় থেকে পার্থসারথির মুদ্রিত সংস্করণ পাঠানো হত মহাকরণ, জাতীয় গ্রন্থাগার, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম,

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, শ্রী রামকৃষ্ণ সেবায়তন, বিবেকানন্দ সোসাইটি, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন, সন্ত আশ্রম, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর, আচার্য নিগমানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, স্বামী শিবানন্দ গিরি, স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট জনের আশ্রমে, সংগঠনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অনেক সংবাদপত্র ও পত্রিকার কার্যালয়ে। অধিকাংশ জায়গাতেই বাবার ব্যক্তিগত পরিচিতি ছিল।

বাবা থাকতে মা পার্থসারথিতে কয়েকবার রম্যরচনা লিখেছেন। আমি পার্থসারথিতে প্রথম কবিতা লেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম আমার ৭ বছর বয়সে, বাবা মায়ের সাথে প্রথমবার পুরীর সমুদ্র দেখার পর। ১৯৮৬র ২৪শে নভেম্বর বাবা চলে যাবার পর মা'কে বলি বাবার সম্বন্ধে লেখার জন্য। প্রথম দিকে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে কয়েকটা রত্নের সন্ধান, তারপর থেকেই আত্মীয়-অনাত্মীয়-বন্ধু-স্বজন সকলের উদ্যমে ওনার নিয়মিত লেখার শুরু পার্থসারথিতে-পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার, স্মৃতিচারণ, অন্যান্য রচনা। তখন মায়ের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। এই লেখনী অব্যাহত ছিল আরও প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর।

মায়ের ছিল তীক্ষ্ণ জিহ্বা। তাঁর লেখাও ছিল সোজা সাপটা। হয় সাদা নয় কালো। যে কোন লেখা ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধির প্রকাশ। কিন্তু পত্রিকার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সেই উপলব্ধিকে সর্বজনগ্রাহ্য করার প্রধান শর্ত - সামাজিক মূল্যবোধ। লেখকের মনে ঔচিত্য বোধ - "পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে"; সম্পাদকের মনে সংশয় – "ঘটে যা তা সব সত্য নহে।"

অতএব মায়ের অকপট "স্মৃতিচারণ" প্রায় প্রতিমাসেই আমাকে পরিমার্জন করতে হতো। বাবা ও মায়ের জীবন সংগ্রাম ছিল অজস্র ঘটনার সমন্বয়। কয়েকজন নিকট আত্মীয়ের দুর্ব্যবহার, প্রতারণা, অর্থনৈতিক তথা পারিবারিক সমস্যা, অতীতের ঘটনাবলীর পুনরুক্তি আত্মীয় বন্ধুদের কাছে আকর্ষণীয় হলেও অপরিচিত দূরের পাঠকের কাছে তার মূল্য না থাকাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত আর নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতির মধ্যে অদৃশ্য সীমারেখা টানার দায়িত্ব থাকে সম্পাদকের উপর। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কাঁচি চালানোর কাজটি দুরূহ এবং বিতর্কিত।

প্রায় প্রতিবারই শল্যচিকিৎসা হওয়ার পরে প্রেসে যেত "স্মৃতিচারণ"। আর, বই প্রকাশের পরেই এসে যেতো লেখিকার ব্যক্তিগত অভিমানের পর্যায়। "লিখব না আর সামনের মাস থেকে।" আমার ছিল ধর্মসঙ্কট। মায়ের লেখা

কোন সংখ্যায় না বেরোলে পত্রিকা-প্রেমী আত্মীয় স্বজন যেমন কারণ জানতে চাইতেন, তেমনি পরিচিত সাধু মহারাজেরাও উদগ্রীব হয়ে উঠতেন মা সুস্থ আছেন কিনা।

২০১১-র পর থেকে বয়সের ভারে মা ক্রমশঃ শারীরিক ভাবে অক্ষম হতে থাকলেন। খিদে আর মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু তাঁর মনে দাগ ফেলে না, অথচ পুরনো স্মৃতিগুলো তরতাজা। সে এক অদ্ভুত যন্ত্রণার সময়। আমাদের হিতৈষী স্বজনেরাও চলে যাচ্ছিলেন না-ফেরার দেশে। আমার বড়কাকা (প্রণব ঘোষ), বড় মামা (সমীর বসু), দীপু মামীমা (রেখা মিত্র)। একের পর এক আঘাত। চলে গেলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিবিদিষানন্দ, পরিবারের সকলের আপনজন কেয়া মাসী (ডঃ কেয়া মুখার্জী), গীতা মাসী (গীতা কুণ্ডু)। শ্যামবাজারের বাড়ীর জ্যেঠিমা (রমারাণী পাল)চলে গেলেন, যিনি শুধু আমার বিশেষ শ্রদ্ধার জন নন, তাঁর পরিবার আজও নিঃস্বার্থ মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে শ্রীপ্রীতিকুমারের সাধনার কঙ্কটিকে। নিতান্ত অসময়ে চলে গেল "মামীমা বলতে অজ্ঞান" অনুদা (অনুরূপ মৈত্র)। সব কথা মা'কে জানানো যেত না। প্রিয়জন বিয়োগের কথা শুনলে সারারাত অস্থিরভাবে জেগে থাকতেন। পুরনো দিনের কথা বলে যেতেন নিজের মনে।

সৃজনশীলতা স্তব্ধ হয়ে গেলে দুর্বহ হয়ে ওঠে গতিশীল মানুষের জীবন। তাই আমি ঘরে ঢুকলেই মায়ের প্রশ্ন ছিল – "বাবু, আর কদিন রে? এবার বাবাকে বল আমাকে নিয়ে নিক। আর পারছি না।" পরিস্থিতি লঘু করার জন্য আমি পরিহাস করতাম। "বেশ ত ভালো আছো। কাজকর্ম নেই, রান্নাবান্না নেই, টেনশন নেই।" হঠাৎ একদিন বললেন, "Isolation কি জিনিষ তুই কি করে বুঝবি?" আজও বুঝে উঠতে পারিনি ঐ উক্তি কি ডিমেনশিয়া পেশেন্টের?

কালের নিয়মে ২৪শে অক্টোবর, ২০১৯ এ মা নিজেই চলে গেছেন স্মৃতির জগতে। যতদিন আছি, তাঁদের নিয়ে স্মৃতিচারণের পালা আমার।

DO NOT COPY

পার্থসারথির জন্মদিনে **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

পার্থসারথি ঊনত্রিশ বছরে পড়লো। ভাবিনি শ্রীপ্রীতিকুমারের সাধ পূর্ণ করতে পারব। তাঁকে সাহায্য করবার কত লোক ছিল। কেউ ঠিকানা লিখে দিতেন, কেউ সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পোষ্ট করে দিতেন, কেউ প্রুফ দেখে দিতেন, বাড়ি বয়ে লেখকরা লেখা দিয়ে যেতেন। আর আজ? কারো সময় নেই। --

শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রয়াণের সাথে সাথে ছাপা খরচ বেড়ে গেল। পরে কাগজের দামও বাড়ল। ওঁর সাথে কত জনের কত কথা হয়েছে আমাকে কিছু বলে যান নি, কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমারের বক্তব্যের মান রাখতে আমি বাধ্য। তাই আমার খরচ অনেক বেড়ে গেল। একথা অনস্বীকার্য আমাদের পত্রিকা যাঁরা প্রকাশ করছেন তাঁরা আমাদের অনেক কনসেশন দেবার চেষ্টা করেন। তবুও আমাকে সতর্ক থাকতে হয় কখন মলাট ভারী হয়ে যায়, কখন একটি পৃষ্ঠা বেড়ে যায়, কখন বেশী সংখ্যক বই ছাপা হয়।

পার্থসারথি প্রকাশের ব্যাপারে সর্বাগ্রে যার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয় তিনি হলেন শ্রী নীরেন মৈত্র। তারপর আছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী সুখদা চরণ মজুমদার, শ্রীমতী রেখা শিকদার, চিত্রা পাল ও মণিকা কুণ্ডু ইত্যাদিরা। মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে যাই, খরচ চালাতে পারিনা – তবু কারও কাছে হাত পাততে পারিনা। নিজে থেকে যে যা করেন তাতেই আমি কৃতজ্ঞ। যারা সাহায্য করছেন তারা তো আমাদের ভালবেসেই করছেন, শ্রীপ্রীতিকুমারের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করছেন। অন্তত দেড় বছর তো আমরা একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে পারলাম।

একদিন যে পার্থসারথি দেখলে আমি ভয় পেতাম, এখন সেই পার্থসারথিকে আমি একটু একটু করে ভালবেসে ফেলছি। যতক্ষণ নতুন বইটা ছাপা হয়ে না আসে আমার যেন কেমন অস্বস্তি হয়। বইটা দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। একা একা যখন ডাকঘরে পোষ্ট করতে যাই মনে হয় তাঁর কথা, যিনি কার্ত্তিক মাসের সংখ্যাটি আমাকে নিয়ে পোষ্ট করতে গেছিলেন। চোখে দেখতেন না, ধীরে ধীরে বই জমা দেবার জায়গাটিতে পৌঁছেছিলেন আমার কাঁধে ভর করে। দেখিয়ে দিয়েছিলেন কাকে কাকে বই পড়তে দিতে হবে। আমার আর ভুল হয়নি সেকাজে।

মাঝে মাঝে "চোখে আঙুল দাদাদের" কাছ থেকে নিছক জ্ঞানের কথাও শুনতে হয়। এই করলে ভাল হয় – ঐ করলে ভাল হয়! আমার অভ্যাস হয়ে গেছে – এখন আর কানও দিই না, যা করবার করে যাই। আমার মনে হয়

পাঠকবর্গ যদি মাঝে মাঝে আমাদের একটি পোষ্টকার্ডে তাঁদের মতামত জানান, আমরা উৎসাহ পাব – পত্রিকাটিকে আরও ভাল করবার চেষ্টা করব। এবং পাঠকবর্গের সাথে আমাদের একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠবে। এ সংখ্যায় আমার পক্ষে স্মৃতিচারণ করা সম্ভব হল না। আগামী সংখ্যায় আবার কলম নিয়ে বসব। আমি গত সংখ্যায় শ্রীপ্রীতিকুমারের বিয়ের আসর পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। বিয়ের আগের যোগাযোগ ও ঘটনাগুলি বলা হয়নি। আসলে গুছিয়ে কলম নিয়ে বসবার মতো মানসিকতা সবসময় থাকেনা।

পার্থসারথির আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছি ১৩৯৩ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে। আমার মনে পড়ছে সেই রবিবার রাতের কথা। আমরা পার্থসারথি প্যাক করতে বসেছিলাম। শ্রীপ্রীতিকুমার এসে প্রথম বইটি প্যাকেট করে দিলেন। ২৪ ঘন্টাও তারপর কাটেনি। পরদিন ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬ সোমবার বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে সব শেষ। দিনগুলি কিভাবে কেটে যায়! প্রথম দিকে বড় অস্থির অস্থির লাগতো। এখন দেখছি মনোযোগ থাকলে, নিষ্ঠা থাকলে কোনও কাজই আর শক্ত মনে হয় না। আমি ও সুনন্দন মোটামুটি বিষয়টি রপ্ত করে নেবার চেষ্টা করছি।

আমাদের আর অন্য লক্ষ্য নেই। এই দেড় বছরে কত কি ঘটে গেল। তবু আমরা তো আছি। দেখছি কতজনের গুরু বদল হয়ে গেল, কতজনের সময়াভাব আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবার। দেখছি কতজন হঠাৎ এসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকছেন আমাদের মানসিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি বুঝে ওঠবার জন্য। কতজন তার ঘরে শ্রীপ্রীতিকুমারকে ঘুরে বেড়াতে দেখছেন! আমার কিন্তু সেই বিদেহী আত্মার প্রতি একটাই প্রার্থনা – বাড়িতে যখন কেউ থাকবে না তখন যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ো না। ধরতে পারব না, ছুঁতে পারব না, সে বড়ো কষ্ট!

আমার কথাই বললাম। শ্রীপ্রীতিকুমারকে বাদ দিয়ে আমার আর কি কথা থাকতে পারে? সে কথাও অনেক ..... অনেক। পার্থসারথিতে যতটা পারব লিখব। **

** (রচনাকাল- জুন, ১৯৮৮)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার স্থায়ী সুর **শ্রী তুফান চক্রবর্তী**

।। প্রস্তাবনা ।।

ভারতীয় সনাতন ধর্মশাস্ত্রের সবচাইতে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ হল শ্রীমদ্ভগদ্গীতা। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতে এই গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। এই গ্রন্থে বৈদিক সত্যের সার সংগ্রহ করে সহজ ভাষায় সুললিত ছন্দে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

আমরা জানি ভারতীয় সঙ্গীত স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত থাকে। স্থায়ী পঙক্তিটি গায়নের মাঝে বার বার ফিরে ফিরে গাওয়া হয়। সেই রকম এই গীতা রূপ মহান সঙ্গীতেরও কি একটা স্থায়ী সুর আছে? এই ধর্মশাস্ত্রের মুল ভাবটি আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করে দেওয়ার জন্য যে কথা বারে-বারে, ফিরে-ফিরে বলেছেন শ্রীভগবান? সেই অন্তর্নিহীত ভাবটির স্বরূপ কি, এখন আমরা সেটাই বোঝার চেষ্টা করবো।

গীতা অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, যে ভাবটি শ্রীভগবান বার বার ব্যক্ত করেছেন সেটি হল "ঐকান্তিক শরণাগতি" এবং "ঈশ্বরে আত্মসমর্পন"। এই কথাটি তিনি কখনও ইঙ্গিতে, কখনও বা স্পষ্ট ভাষায় অর্জুনকে বারে বারে বলেছেন।

এই "ঐকান্তিক শরণাগতি" এবং "ঈশ্বরে আত্মসমর্পনের" পথটি ভক্তিযোগের একটি মুখ্য সাধনা। এটি সার্বজনীন সাধনা, অর্থাৎ এই সাধনাতে কোনও অধিকারী ভেদ নেই, যে কেউ এই সাধনা করতে পারে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যদের মতে শরণাগতি মানে হল – ঈশ্বরকে করুণাময় জেনে, তাঁর কৃপাময় পাবনীশক্তির উপরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁকে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। এই শরণাগতি পঞ্চাবয়ব – ঈশ্বরভক্তির অনুকুল বস্তু গ্রহণ, ভক্তি বিরোধী বস্তুর বর্জন, তাঁর করুণাশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, শুধুমাত্র ঈশ্বরকেই চাওয়া আর দীনতার সঙ্গে তাঁকে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। শরণাগত ভক্তকে যে তিনি কখনোই পরিত্যাগ করেন না, উপরন্তু সেই ভক্তের সব দায় নিজস্কন্ধে বহন করেন, তা তিনি নিজমুখে স্বীকার করেছেন শ্রীমদ্ভবদ্গীতায়।

***

এখন আমরা বিশদে বোঝার চেষ্টা করবো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান কোথায় এবং কি ভাষায় এই "ঐকান্তিক শরণাগতি" এবং "ঈশ্বরে আত্মসমর্পনের" কথা বলেছেন।

আমরা জানি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্‌মুহূর্তে অর্জুন নিদারুণ শোক ও মোহে অভিভূত হয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অর্জুনের সারথীরূপী শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে তাঁকে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তাঁর শোক ও মোহ দূর করেছিলেন। কিন্তু আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করি যে, কৃষ্ণসখা অর্জুন সম্পূর্ণ প্রথম অধ্যায় জুড়ে অতক্ষণ ধরে তাঁর মনের নিদারুণ পরিস্থিতি বিশদে শ্রীকৃষ্ণকে জানানোর পরেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখার প্রতি ধর্ম উপদেশ আরম্ভ করলেন না, শুধু একটু তিরস্কার করেই চুপ করলেন। কিন্তু অর্জুন যেইমাত্র "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" অর্থাৎ "আমি আপনার শিষ্য আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ করুন" (২/৭) বলে তাঁর শরণাগত হলেন তখনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করুণাধারায়, অমৃতময়ী বাক্যে অর্জুনকে সিঞ্চিত করতে শুরু করলেন। সুতরাং যে গীতা শাস্ত্রের আরম্ভই শরণাগতি দিয়ে সেই শাস্ত্রের মূলসুর যে শরণাগতি তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারেনা।

এরপর শ্রীভগবান অর্জুনের শোক ও মোহ দূর করার জন্য প্রথমে দেহ হতে আত্মার পৃথকত্ব ও আত্মার অবিনাশিত্ব, তারপর ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম এবং পরিশেষে ভক্তিমিশ্রিত নিষ্কামকর্মের শিক্ষা দিলেন যা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ থেকে ৫৩ শ্লোকের মধ্যে পাই। ৫৪ শ্লোকে অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞ বা সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ জানার জন্য প্রশ্ন করলেন। তার উত্তরে শ্রীভগবান বললেন – "যিনি সমস্ত কামনা বর্জন করে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য, যাঁর অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে, যিনি দেহ-জীবনাদি সমস্ত বিষয়ে মমত্বশূন্য, শুভপ্রাপ্তিতে সন্তোষ বা অশুভপ্রাপ্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, বাহ্যবিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে যিনি কচ্ছপের মতন গুটিয়ে রাখেন তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। তারপর শ্রীভগবান বলছেন চিত্ত-বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ অতি সংযমশীল ব্যক্তির মনও বলপূর্বক হরন করে। তাহলে উপায়? শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬১ শ্লোকে বলছেন – "তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ," অর্থাৎ যিনি আমার অনন্যভক্ত তিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করে আমাতে চিত্ত সমাহিত করে অবস্থান করেন। যে ভক্তসাধক শ্রীভগবানকে একমাত্র পরমপ্রাপ্তব্য বলে মনে করেন তিনিই একমাত্র ঈশ্বরপরায়ণ, তিনিই "মৎপরঃ"।

"যুক্ত আসীত মৎপরঃ" এই শব্দবন্ধটি আরেকবার পাই আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে। সেখানেও শ্রীভগবান মনঃসংযমের কথা বলতে গিয়ে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন।

আমরা এখানে স্পষ্ট বুঝতে পারি ইন্দ্রিয়সংযম বা মনঃসংযমের সহজ পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আমাদের তাঁর পরায়ণ অর্থাৎ ঈশ্বর পরায়ণ হতে বলছেন। অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানতে চেয়েছিলেন, তার উত্তরে শ্রীভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ যে ইন্দ্রিয় সংযম সেটি নির্দেশ করলেন। তারপর, সেই ইন্দ্রিয়সংযমের সহজতম পথ যে তাঁর শরনাগত হওয়া সেটিই এখানে অতি স্পষ্ট করে বলেছেন। ঈশ্বরে অনুরাগ এলে বিষয়ে অনুরাগ আপনা থেকেই চলে যায়। সুতরাং ঈশ্বরচিন্তাই যে ইন্দ্রিয়-সংযমের মহৌষধ সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই।

এইভাবে শ্রীভগবান তাঁর গীতোপদেশের প্রারম্ভ থেকেই শরণাগতির কথা বলতে শুরু করেছেন এবং বার বার এই সহজ পথটি বিশেষ ভাবে নির্দেশ করে আমাদের যেন সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন এই সহজ পথে তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্যে।

***

এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান কর্মযোগের অবতারণা করেছেন। এখানেও নিষ্কাম কর্মের উপায় রূপে প্রথমে আত্মাতে সন্তুষ্ট আত্মারাম জ্ঞানীর ভাবানুযায়ী ফলাসক্তি বর্জন করে কর্ম করার উপদেশ দিলেন। তারপরে অহঙ্কার বর্জিত নির্লিপ্ত বুদ্ধিতে কর্ম করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু ৩০ সংখ্যক শ্লোকে তিনি বলছেন – "ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা" অর্থাৎ "বিবেকবুদ্ধিদ্বারা আমাতে সমস্তকর্ম সমর্পণ করো।" এখানেও শ্রীভগবান কর্মযোগের সহজ পন্থা স্পষ্ট করে নির্দেশ করে দিচ্ছেন। ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করতে হবে আমাদের। তাহলে সেই কর্মের ফল আর আমাদের উপরে বর্তাবে না। ঈশ্বর তাঁর অনন্ত কৃপাগুণে আমাদের সমস্ত কর্মভোগ কাটিয়ে মোক্ষের অধিকারী করে দেবেন।

এরপর চতুর্থ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে শ্রীভগবান তাঁর সর্বপ্লাবি করুণার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে প্রতিজ্ঞা করছেন - "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম" অর্থাৎ যে যেখানে, যেভাবে, যে অবস্থায় আমার শরণ নেয় তাকে সেইখানে, সেইভাবে, সেই অবস্থায় আমি অনুগ্রহ করি। যে বিষয় কামনা করে তিনি তাকে কাম্যবস্তু প্রদান করেন, যে মোক্ষ কামনা করে তিনি তাকে মোক্ষফল প্রদান করেন, আর যে ভক্তি প্রার্থনা করে তাকে তিনি ভক্তি প্রদান করেন। এখানে লক্ষণীয় যে তাঁর শরণ নেওয়ার কোন বিশেষ স্থান কাল পাত্র নেই। সাধকের চিত্তে যখনই তাঁর চিন্তার উদয় হবে তখনই সাধক তাঁর শরণ নিতে

পারে। আর তিনি সেই শরণাগত সাধককে তৎক্ষণাৎ কৃপা করবেন বলে শ্রীভগবান এখানে অঙ্গীকার করছেন।

এরপর, পঞ্চম অধ্যায়ের শুরু থেকে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান নিষ্কাম কর্মের পথ ধরে সর্ব কর্মত্যাগের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় ব্যখ্যা করেছেন। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয় আর তারপর সেই শুদ্ধমনে ব্রহ্মজ্ঞান আপনা থেকেই স্ফুরিত হয়। তখন সেই যোগী অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন করেন এবং ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে অবস্থান করেন। পরিশেষে ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু কি সেই জ্ঞান যা জেনে মগ্নচিত্ত যোগীরা সর্ব বন্ধনমুক্ত হন? তার উত্তরে শ্রীভগবান বলেছেন "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।। (৫/২৯) অর্থাৎ কর্তা ও দেবতা রূপে আমি যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদ এই প্রকারে আমাকে স্বীয় আত্মরূপে জেনে যোগী পরমা শান্তি (মুক্তি) লাভ করেন।

শ্রীভগবান এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনিই সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি সমস্ত লোকের, অর্থাৎ মর্ত্যলোক থেকে ব্রহ্মলোক, সর্ব লোকের মহেশ্বর। তিনি সর্ব জীবের সুহৃৎ অর্থাৎ কোন প্রত্যুপকার আশা না করেই তাদের পরম উপকার সাধন করেন। সেই তাঁকে জেনে, তাঁতে মন সমাহিত করে যোগী চিরশান্তির অধিকারী হন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মনঃসংযম, নিষ্কাম কর্ম এবং জ্ঞান এই তিনেরই সহজতম উপায় হিসেবে শ্রীভগবান তাঁর প্রতি ঐকান্তিক শরণাগতি এবং আত্মসমর্পন মার্গকেই নির্দেশ করছেন।

***

এরপর ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানের প্রক্রিয়া এবং মনঃসংযমের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু তিনি ধ্যানের সহজ পথ হিসেবে তাঁতেই মনকে সমাহিত করে রাখার কথাই বার বার বলেছেন। এই অধ্যায়ের ১৪ ও ১৫ সংখ্যক শ্লোকে তিনি বলেছেন যোগ-সাধনা এবং মনঃসংযমের ফলে তাঁকেই লাভ করা যায়, এবং ৩০ ও ৩১ শ্লোকে তাঁ'তে মনকে সমাহিত করাই যে ধ্যানের সহজ পথ সেই কথা বলেছেন। এরপর অর্জুন প্রশ্ন করেছেন, "মন অতি চঞ্চল, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা আকাশের বায়ুকে একটা পাত্রে বন্ধ করার মতই দুঃসাধ্য। তাহলে কি ভাবে মনকে সংযত করা যাবে?" উত্তরে শ্রীভগবান বললেন, "মন যে চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ধ্যানাভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে সংযত করা যায়।" অর্জুন আবার প্রশ্ন করেছেন, "যে যোগীরা যোগের পথে চলতে চলতে কোন কারণে

পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েন তাঁদের কি গতি হবে?" তার উত্তরে শ্রীভগবান তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভয়প্রদ করুণা প্রকাশ করে বলেছেন – "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" অর্থাৎ কল্যাণের পথে যিনি চলেন তাঁর কখনো দুর্গতি হয় না। সেই যোগভ্রষ্ট সাধক আবার পরজন্মে তাঁর সাধনার ধারা সেই জায়গা থেকেই পুনরায় শুরু করতে পারবেন। এই রকমে অর্জুনের উপর্যুপরি প্রশ্ন দেখে শ্রীভগবান অর্জুনকে আশ্বস্ত করার জন্য এই অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে নিজেকে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন – যিনি শ্রদ্ধার সহিত মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনি সকল যোগীর মধ্যে উৎকৃষ্ট, এইই আমার অভিমত।(৬/৪৭)

এখানে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাবে শ্রীভগবান সকল যোগের সহজ পথ সুনির্দিষ্ট করে বলছেন - শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর চিন্তায় মনকে নিমগ্ন করতে। তাহলেই মোক্ষফল আমাদের করায়ত্ত হবে। আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, এখানে শ্রীভগবান উৎকৃষ্ট যোগীর পরিচয় দিয়েছেন – যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর চিন্তায় মনকে নিমগ্ন রাখেন। কই এখানে বেদপাঠ, দর্শন শাস্ত্রের বিচার, আনুষ্ঠানিক উপাসনা করার কথা তো বললেন না? বললেন না তো রাজযোগের দুরূহ তত্ত্বের কথা! বা কোনো অতিলৌকিক অলৌকিক অভ্যাসের কথা! শুধু তাঁর চিন্তায় মনকে নিমগ্ন রাখার কথাই বললেন। শ্রীভগবান আমাদের চোখের সামনে বারে বারে সহজ পথটি তুলে ধরেছেন, কিন্তু আমরা যদি সেই সহজ পথ সহজ ভাবে না নিয়ে, ক্রমশ জটিল পথের সন্ধানে ঘুরে মরি তাহলে তার দায় আমাদের।

***

সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই তিনি আবার বলেছেন তাঁর শরণাগত ভক্ত তাঁ'তে মনোনিবেশ পূর্বক যোগাভ্যাস করলে তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে জানতে পারেন। আবার চৌদ্দ শ্লোকে শ্রীভগবান তাঁর মায়ার স্বরূপ এবং মায়াকে অতিক্রম করার একমাত্র সহজ পথ আমাদের কাছে কত সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (৭/১৪)

বঙ্গানুবাদ – যেহেতু আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টকর, যাঁরা ধর্মাধর্ম পরিত্যাগপূর্বক আমাকে

আশ্রয় করেন এবং অন্য প্রকার সাধনের উপর নির্ভর করেন না, তাঁরাই কেবল আমার এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন, অর্থাৎ সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হন।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। প্রথমতঃ শ্রীভগবান তাঁর মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা বলে তাঁর নিজের ত্রিগুণাতীত নির্গুন স্বরূপের পরিচয় দিচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর মায়া দৈবী অর্থাৎ দেবতারাও এই মায়াকে অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখেন না। তৃতীয়তঃ একমাত্র কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত হলেই এই দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করা যায়। অন্য কোন উপায় নেই। তাঁর শরণাগত ভক্তকেই একমাত্র তিনি কৃপা করে এই মায়ার পারে নিয়ে যান। চতুর্থতঃ শরণাগতির পথ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা সাধন পথ যা অন্য সাধন পথের থেকে স্বতন্ত্র। এই সাধনপথ সাধককে শ্রীভগবানের সবচেয়ে কাছাকাছি নিয়ে যায়। যাকে শ্রীভগবানের অদেয় কিছুই থাকে না। তিনি কৃপা করে তাকে তিনগুণের পারে নিয়ে গিয়ে তার কাছে তাঁর ত্রিগুণাতীত আনন্দময় স্বরূপটি প্রকটিত করেন।

অষ্টম অধ্যায়ে কিছু পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা করার পরে অর্জুনকে বলছেন – সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং স্বীয় ক্ষাত্রধর্ম পালন হেতু যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে আমাকেই লাভ করবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। (৮/৭) এখানে শ্রীভগবান স্পষ্টতঃ অর্জুনকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁকে স্মরণ করতে করতে যুদ্ধ করার জন্য। আবার ১৪ শ্লোকে তিনি বলেছেন – যিনি একাগ্র মনে আমাকে যাবজ্জীবন নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সদা স্মরণশীল যোগীর আমি সহজলভ্য।

এখানে স্পষ্ট ভাবেই শ্রীভগবান তাঁকে পাওয়ার সহজ পথ বলে দিচ্ছেন। সব সময় মনকে তাঁর চিন্তায় ডুবিয়ে রাখাই সেই সহজ পথ। তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর চিন্তায় মনকে ডুবিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু আমরা সব কাজকর্মের মধ্যে কি ভাবে তাঁর চিন্তায় মনকে ডুবিয়ে রাখবো? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে তার ইঙ্গিত পাই আমরা – "যেমন দাঁতের ব্যথা হলে সব কাজের মধ্যেও মনটা সেই ব্যাথার দিকে পড়ে থাকে সেই রকম ভাবে ঈশ্বরচিন্তায় মনকে ডুবিয়ে রাখতে হয়।"

পরবর্তী ১৬ সংখ্যক শ্লোকে তিনি তাঁর শরণাগত ভক্তের পুনর্জন্ম নাশের কথা বলেছেন – হে অর্জুন পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সপ্তলোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

শ্রীভগবানের বাণী স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট ভাবে বলছেন তাঁর শরণাগত ভক্তকে তিনি জন্মমৃত্যুরূপ সংসার চক্র থেকে মুক্ত করে দেন। এমন অভয়প্রদ সহজ সরল পথ তিনি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারপরও যদি আমরা সেই সহজ পথে না চলি তাহলে তা আমাদেরই বুদ্ধির দোষ।

***

তারপরে নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান আবার তাঁর শরণাগত ভক্তদের জন্য তিনি যে দায়বদ্ধ সেটা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন এবং তাঁকে পাবার পথ কতটা সহজ সেটা তিনি নিজমুখে বলে দিয়েছেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম।। (৯/২২)

অর্থাৎ– আমাকেই (শ্রীভগবানকেই) আত্মভাবে চিন্তাপূর্বক যে সর্বত্যাগিগণ আমার ধ্যান করেন, সেই নিত্য-সমাহিত মুমুক্ষুগণের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি।

অনন্যচিত্ত অর্থাৎ আর কোনও কিছুর ওপরে নির্ভর না করে যে ভক্ত শুধু ঈশ্বরের ওপরেই নির্ভর করেন, বাহুবল, বুদ্ধিবল, অর্থবল, জনবল ইত্যাদির ওপর নির্ভর না করে শুধুমাত্র তাঁর কৃপার ওপরে নির্ভর করে যে ভক্ত তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে থাকেন সেই 'নিত্য-সমাহিত' অর্থাৎ ঈশ্বরে নিমগ্ন চিত্ত ভক্তের যোগ ও ক্ষেম শ্রীভগবান বহন করেন। যোগ মানে যা প্রয়োজনীয় তার প্রাপ্তি আর ক্ষেম মানে সেই প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ। শ্রীভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন শরণাগত ভক্ত তাঁ'তে নিমগ্ন চিত্ত হয়ে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করতে না পারলেও কোনও চিন্তা নেই, তিনি নিজে তার জোগাড় করে দেবেন। এর চেয়ে পরম আশ্বাসের বাণী আর কি হতে পারে? ভক্তদের জীবন কাহিনী আলোচনা করলেই এই প্রতিজ্ঞার সত্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে

DO NOT COPY

বড়কথা হল, এই পথে চলতে চলতে এই প্রতিজ্ঞার সত্যতা সাধক বারবার নিজেই উপলব্ধি করতে পারেন। শরণাগত ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর কৃপাদ্বার উন্মুক্ত করে রাখেন। আবার এও সত্য যে, এই রকম প্রেমিক ভক্তেরা তাঁকে ছাড়া আর কিছুই আকাঙ্খা করেন না। কোনও জাগতিক সুখভোগের ইচ্ছা তাঁদের শুদ্ধ মনে কস্মিনকালেও উদয় হয় না।

এরপরে আবার বলছেন - যে শুভবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁহার সেই ভক্তিপূত উপহার প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করি (৯/২৬)। আনুষ্ঠানিক পূজা, বিধিবাদীয় উপাসনা এখানে নিরস্ত করা হল। শুধু ভক্তির সঙ্গে তাঁকে যেটুকু দেওয়া যায় তিনি তাই পরম প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেন। এর চেয়ে সহজ করে আর কি ভাবে বলবেন তিনি? তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর গগনচুম্বী মন্দিরের ঐশ্বর্য মণ্ডিত উচ্চ সিংহাসন থেকে নেমে এসে দীন ভক্তের পাশে পথের ধূলায় নিজের আসন পেতেছেন। শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে কোনও বিধিনিয়মের বালাই নেই। শুধু শরণাগতি, শুধু সর্বস্ব-সমর্পন, শুধু ভক্তি, আর কিছুই তিনি চাননা।

এর পরের শ্লোকে বলছেন, অতএব হে কৌন্তেয়, যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর সেই সমস্ত আমাকে সমর্পণ করবে। "যত করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত তপস্যসি কৌন্তেয় তত কুরুস্ব মদর্পণম।।" (৯/২৭)

তাঁর ভক্ত সারাদিন যা কাজ করবেন সেই সব তাঁকে স্মরণ করতে করতে করবেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে কাজটি শুরু করবেন, কাজটি চলার মাঝে তাঁকে স্মরণ করবেন আর শেষ হলে সমস্ত কাজটি তাঁকেই সমর্পণ করে দেবেন। কত সহজ সাধনার কথা তিনি বলেছেন। বনে গিয়ে বা গিরিগুহায় বসে তপস্যা করার কথা তিনি বলেননি। প্রাত্যহিক জীবনের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়, সেই কাজের মাঝেই মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই পথটিই তিনি পরম কৃপাভরে সহজ করে আমাদের দৃষ্টি পথে স্পষ্ট করে মেলে দিয়েছেন।

পরবর্তী ৩৩ শ্লোকে তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর ভজনা করতে অর্জুনকে বলেছেন – "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" অর্থাৎ যখন এই অনিত্য এবং সুখহীন মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছ তখন অন্যান্য সকল কর্তব্য ত্যাগ করে আমাকেই ভজনা কর।

তার পরবর্তী শ্লোকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে শ্রীভগবান সর্বাবস্থায় তাঁর শরণাগত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মত পরায়ণঃ।।" (৯/৩৪) অর্থাৎ তুমি মদ্গতচিত্ত হও; আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম কর। এইরূপে মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন ও বুদ্ধি সমাহিত করলে আমাকেই লাভ করবে।

***

দশম অধ্যায়ে তিনি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়ে নিজের স্বরূপ নিজমুখে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অর্জুনকে বলেছেন – "তুমি আমার বাক্যশ্রবণে আনন্দিত হও, তাই তোমার শ্রেয়ঃ কামনা করে উৎকৃষ্ট তত্ত্বকথা আবার বলছি। (১০/১) যিনি আমাকে আদিহীন, জন্মরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, মনুষ্য মধ্যে তিনিই মোহশূন্য হয়ে সর্বপাপ হতে মুক্ত হন। (১০/৩) আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তিস্থান, আমা হতেই এই সমস্ত প্রবর্তিত হয় – এই জেনে তত্ত্বজ্ঞানীগন পরমার্থতত্ত্বে অভিনিবেশপূর্বক আমার ভজনা করেন। (১০/৮) যাঁরা নিত্যযুক্ত হয়ে ভক্তিপূর্বক আমায় ভজনা করেন, আমি তাঁদের আমার তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান প্রদান করি যাতে তাঁরা আমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করতে পারেন। (১০/১০)" তাঁর শরণাগত ভক্তকে যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতেই পারে না।

শ্রীভগবান স্পষ্ট ভাষায় পরিষ্কার করে যা বলেছেন আমরা যদি তা সহজ করে না বুঝে নানা শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব ঘেঁটে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি যে – না ঈশ্বর লাভের পথ অনেক কঠিন, এত সহজে তাঁকে লাভ করাই যায় না, বেদ নিরুক্ত ষড়দর্শন অধ্যয়ন করতে হবে, আনুষ্ঠানিক উপাসনায় বিধিবদ্ধ শিক্ষা নিতে হবে, বনে গিয়ে হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হয়ে কঠোর তপস্যা করতে হবে, তা না হলে জ্ঞান লাভ হবে না। - তাহলে আমরা বলব শ্রীভগবান যাকে যেমন বোঝাবেন তিনি সেরকম বুঝবেন তাতে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু আমাদের তিনি কৃপা করে সহজে তাঁর বাণী ধারণা করবার শক্তি দিয়েছেন আমরা সেই পথেই চলব। অসীম সৌভাগ্যে যখন একবার তাঁর কৃপার বৃত্তে এসে পড়তে পেরেছি তখন কোন মূল্যেই এই সহজ পথ ছেড়ে, তাঁর সব ভুলানো অতুলনীয় ভালবাসা ছেড়ে আর কোন পথে চলতে পারব না।

DO NOT COPY

একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনের করালেন। বিশ্বরূপ দর্শন করানোর পরে অর্জুনকে বলেছেন – তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করলে এই বিশ্বরূপ বেদপাঠ, চান্দ্রায়নাদি তপস্যা, গো-সুবর্ণাদি দান বা পুজার দ্বারা দর্শন করা যায় না। (১১/৫৩)

তবে তাঁর দর্শন কি উপায়ে পাওয়া যায়? "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।।" (১১/৫৪) অর্থাৎ হে অর্জুন, কেবলমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ আমাকে জানতে ও স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশ রূপ মোক্ষ লাভ করতে ভক্তগন সমর্থ হয়, অন্য উপায়ে নয়।

পুনশ্চ "মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিত। নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।" (১১/৫৫) অর্থাৎ হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি মৎকর্মকারী, মন্নিষ্ঠ, মদ্ভক্ত ও আত্মীয়-স্বজনাদিতে আসক্তিশূন্য এবং সর্বভূতে, এমনকি অত্যন্ত অপকারীর প্রতিও বৈরভাববিহীন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীভগবানের এমন স্পষ্ট এবং সরল উপদেশের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন – "হে ভগবান, এই ভাবে নিরন্তর ভগবৎকর্মাদিতে নিযুক্ত হয়ে যে সকল অনন্যশরণ ভক্ত সমাহিত চিত্তে আপনার উপাসনা করেন এবং যাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী?" উত্তরে শ্রী ভগবান বললেন – পরমেশ্বরের ভজনা দ্বারাই জীবের উদ্ধার হয় – এই বিশ্বাস দৃঢ় করে যাঁরা আমার বিশ্বরূপে মনোনিবেশপূর্বক মৎচিত্ত হয়ে অহোরাত্র অতিবাহিত করেন, তাঁরাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। (১২/২)

আবার বলছেন- হে পার্থ, যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক 'আমিই পরমপুরুষার্থ রূপে উপাস্য' – এই ভাবে মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য যোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করেন, মদ্গতচিত্ত সেই সকল ভক্তকে মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে আমি অচিরে উদ্ধার করি। (১২/৬ -৭)

DO NOT COPY

অতএব "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়।।" (১২/৮) অর্থাৎ – আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। এইরূপ করলে দেহান্তে তুমি নিশ্চয় মৎস্বরূপে স্থিতিলাভ করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এরপর এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীভগবান আবার বলেছেন – যে সকল মৎপরায়ণ ভক্ত এই মোক্ষদায়ক ধর্ম উক্তপ্রকারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে সাধন করেন, তাঁরাই আমার অতীব প্রিয়। (১২/২০)

গীতার স্থায়ী সুর যে "ঐকান্তিক শরণাগতি" এবং "ঈশ্বরে আত্মসমর্পন" সে বিষয়ে কি আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

***

এরপর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আত্মজ্ঞানের সাধন বলতে গিয়ে শ্রীভগবান বলেছেন – "ময়িচানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" (১৩/১০) অর্থাৎ "ভগবানই একমাত্র গতি – এই নিশ্চিত বুদ্ধি দ্বারা শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি।" অনন্য অচলা ভক্তিই তাঁর স্বরূপজ্ঞান লাভ করবার প্রকৃষ্ট উপায়।

চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান পুনরায় ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে তিনগুণের বিষয়ের অবতারনা করেছেন। অর্জুন জানতে চাইলেন কিভাবে এই তিনগুণের অতীত হওয়া যায়? তার উত্তরে তিনি বলেছেন - যে নিষ্কাম কর্মী ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত সর্বান্তর্যামী আমার উপাসনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হন। (১৪/২৬)

পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান তাঁর আধ্যাত্মিক স্বরূপ পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর নির্গুন সত্তাকে আমরা আমাদের মনবুদ্ধির সীমিত ব্যাপ্তি দ্বারা পূর্ণ মাত্রায় ধারণা করতে পারবো না বলে তিনি তাঁর পুরুষোত্তম সত্তাকে আমাদের সামনে স্থাপনা করলেন যাতে আমরা তাঁর স্বরূপের আভাস পাই। তাঁর করুণার কোন পরিধি নেই। যে তত্বকে বেদ-উপনিষদে মন-বুদ্ধির অগোচর বলা হয়েছে সেই তত্ব তিনি যতটা সম্ভব আমাদের সামনে স্পষ্ট ভাবে মেলে

DO NOT COPY

ধরার চেষ্টা করেছেন যাতে অনন্যা ভক্তির পথে চলতে আমাদের সুবিধে হয়। যাতে ভক্তির পথে চলে আমরা আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে তিনি নানা ভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি এ পর্যন্ত বলা তাঁর সমগ্র বাণীর উপসংহার করার পর বলেছেন – সর্বদা সকল কর্ম করেও আমার বিশেষ শরণাগত ভক্ত আমার অনুগ্রহে শাশ্বত অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হন। (১৮/৫৬)

অর্থাৎ সব কাজের মধ্যেই আমরা আমাদের মনকে যদি তাঁর শরণাগত করে রাখতে পারি তাহলেই তাঁর শাশ্বত অক্ষয় ধাম প্রাপ্ত হব। তাঁর স্বমুখে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞা আমাদের সব তর্কবিচারের অবসান করুক এই প্রার্থনা।

আবার বলছেন – আমাতে চিত্ত অর্পণ করলে আমার অনুগ্রহে তুমি দুস্তর সংসার ও তার কারণসমূহ অতিক্রম করবে। আর যদি তুমি পাণ্ডিত্যাভিমানবশতঃ আমার কথা না শোন, তাহলে তুমি পুরুষার্থের অযোগ্য হবে। (১৮/৫৮)

তাঁর সুদীর্ঘ উপদেশে ইতি টানার আগে তাঁর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ অর্জুনকে পুনরায় দুটি শ্লোকে বলেছেন। যেন বিদায় নেওয়ার আগে তাঁর প্রাণের গভীরের উৎকৃষ্টতম চিন্তাটি তাঁর প্রিয়সখার মনে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত করে দিচ্ছেন।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।। (১৮/৬৫)

তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এইজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে এইরূপেই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। (১৮/৬৬)

DO NOT COPY

সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক পরমেশ্বররূপ একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমা অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে আমাকে সদা স্মরণ কর। তুমি এইরূপ নিশ্চিতবুদ্ধিযুক্ত ও স্মরণশীল হলে তোমার নিকট আমি স্বাত্মভাব প্রকটিত করে সকল ধর্মাধর্ম বন্ধনরূপ পাপ হতে তোমাকে মুক্ত করব। অতএব, শোক কোরো না।

কার্যতঃ এই শ্লোকেই শ্রীগীতার উপদেশ শেষ হল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে যে ধর্ম উপদেশের আরম্ভ, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টিতম শ্লোকে তার পরিসমাপ্তি। অর্জুন শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা করার পরে তিনি ধর্মোপদেশ আরম্ভ করেন আর তা শেষ করলেন সেই শরণাগতির কথা দিয়েই।

।। উপসংহার ।।

আমরা দেখলাম শ্রীভগবান বারবার আমাদের মনে একটি শিক্ষাই দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত করে দিয়েছেন, সেটি হল "ঐকান্তিক শরণাগতি" এবং "ঈশ্বরে আত্মসমর্পন" এর শিক্ষা। শ্রীভগবান যেন সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়টির প্রতি বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। যেমন নিমন্ত্রণ বাড়িতে গৃহকর্তা সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যটি খেতে তাঁর প্রিয়জনদের বারবার অনুরোধ করেন, এ যেন ঠিক সেইরকম। অথবা কোনও প্রিয়জন কে অসুস্থ দেখলে আমরা যেমন যে ঔষধে আগে কখনও উপকার পেয়েছি সেই ঔষধ সেবন করতে বারবার অনুরোধ করি – সেইরকম। শ্রীভগবান পরম করুণাভরে তাঁর কাছে পৌঁছাবার সহজতম অথচ অমোঘ পথটি বারবার আমাদের সামনে দৃঢ় ভাবে তুলে ধরেছেন। অনন্ত শাস্ত্রের অসংখ্য ভাবরাশির মধ্যে থেকে যে ভাবটি সবচেয়ে সহজ এবং আশুফলপ্রদ সেই একটি ভাব, অনেক পথের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট পথটি ধরে চলার জন্য বারবার আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। এই সহজ পথটি আমাদের নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যেন তিনি আমাদের কাছে দায়বদ্ধ। অবতার লীলার এই হল বিশেষত্ব। ঈশ্বরের অসীম করুণাশক্তির চরমতম বহিঃপ্রকাশ হল অবতার লীলা। তাঁর করুণা যেন এখানে বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতন। মানুষের কাছে যেন তিনি দায়বদ্ধ হয়ে পড়েন। এই মধুর অবতার লীলার আস্বাদন মানবজন্মের পরমপ্রাপ্তি।

DO NOT COPY

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা সানন্দে দেখতে পাই যে, শ্রীভগবান আমাদের মতন সাধারণ মানুষের কথা ভেবে তাঁর প্রেমময় সুহৃৎ-রূপ আমাদের সামনে বারে বারে মেলে ধরছেন। আমরা নানা সাংসারিক কাজে ব্যপৃত থাকার মাঝে তাঁর বাণীর অধ্যয়ন করতে গিয়ে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক নির্গুণ সত্বার ধারণা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে করতে পারব না। তাই তিনি তাঁর করুণাময় সগুণ বিভাবের আলোকে আমাদের বুদ্ধিকে সর্বদা আলোকিত রাখার উপায় প্রদর্শন করে, এইভাবে তাঁর প্রেমপূর্ণ সত্তার পরিচয় প্রদান করেছেন।

পরিশেষে এইটুকু বলার যে - সাধক যত ভগবদ্বাণীর মনন করবেন তত নূতন আলোকে সে বাণীর মর্মার্থ তাঁর চিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সর্বস্বসমর্পণ পূর্বক শরণাগতির সরল পথে তাঁর কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায়। তিনি নিজমুখে বলেছেন তিনি সর্বভূতের সুহৃৎ অর্থাৎ প্রত্যুপকার নিরপেক্ষ উপকারী বন্ধু। ভক্তের কাতর প্রার্থনায় তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়। তিনি ভক্তের হৃদয় প্রেমভক্তিরূপ অমৃতে পূর্ণ করে তাকে আনন্দে ভরিয়ে দেন।

ঋণ স্বীকার – শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, অনুবাদ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। গূঢ়ার্থ দীপিকা – শ্রী মধুসূদন সরস্বতী, অনুবাদ স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টিকা, অনুবাদ – স্বামী ভাবঘনানন্দ।

"কোন অনুষ্ঠান, দৈনিক তপস্যা, নিয়ম বা সংযমাদির প্রয়োজন নেই এ যোগে। দৈনিক বা নৈতিক বাধা-নিষেধের ফলে বাহ্যতঃ একটা শুদ্ধি ও সাত্ত্বিকতার ভাব আসে বটে, কিন্তু তলায় অশুদ্ধি জমাট হয়েই থাকে। বাহ্যিক নিয়ম সংযম নয়, চাই ভিতরের অন্তরের মধ্যে সংযম; সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের বস্তু।"

-শ্রীঅরবিন্দ

DO NOT COPY

শিখগুরু নানক ভজন সভায় বসে ভজন করছেন। এমন সময় তাঁর সভায় এসে উপস্থিত হলেন একজন যোগী।

যোগীবরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন গুরু নানক।

যোগীবর নানকের সহৃদয় আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তারপর লক্ষ্য করতে লাগলেন যে নানকের শিষ্যরা গুরুর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং নিবেদিত প্রাণ।

তাই লক্ষ্য করে একদিন যোগীবর বলতে লাগলেন নানককে, গুরুজী, আপনার কিন্তু শিষ্য ভাগ্য চমৎকার। তারা আপনার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাবাপন্ন।

যোগীবরের কথা শুনে হাসলেন নানক। তিনি বললেন আপনি যতখানি ভাল আমার শিষ্যদের মনে করেন তারা কিন্তু ততটা নয়। তাদের মনে আমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা যে আছে সে বিষয়ে আমার মনে ঘোর সন্দেহ আছে। অবশ্য সকল শিষ্যের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। এর মধ্যে ব্যতিক্রমও আছে। হয়তো আপনি যেমনটি আশা করছেন ঠিক তেমনটি শিষ্য আছে। সে সত্যিই আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং গুরুগত প্রাণ।

তাই শুনে যোগীবর আবার হাসলেন।

এরপর নানক যোগীবরকে বললেন, আমার শিষ্যরা আমার প্রতি যে কতখানি শ্রদ্ধাশীল তার নমুনা এখুনি দেখতে পাবেন। দাঁড়ান আমি এই ব্যাপারে একটা ফন্দী বের করেছি। সেটি আপনাকে দেখাচ্ছি।

এই বলে গুরু নানক ক্ষণিকের জন্যে যোগীবরের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এলেন ভজন সভায়। তাঁর বেশভূষা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আগে পরেছিলেন পীত রঙের আলখাল্লা, এবার পরলেন মলিন বেশ। হাতে একটা শাণিত তরবারি। সেই সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি কুকুর। ওগুলি শিকারী কুকুর। নানকের ঐ পোষাক দেখে উপস্থিত ভক্ত ও শিষ্যগণ অবাক হলেন। ভাবলেন, গুরুজী হচ্ছেন একজন তপস্বী। তিনি সকল সময়ের জন্যে ঈশ্বরের নামগান নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিনি আবার শিকারে যাবেন কি ভাবে? তাঁর পক্ষে কি শিকারে যাওয়া উচিত? ভক্ত ও শিষ্যরা এই প্রকার চিন্তা করতে লাগলেন। নানক সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে যোগীবরকে নিয়ে প্রবেশ করলেন অরণ্যে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলেন তাঁর অগণিত ভক্ত ও শিষ্যের দল। গভীর বনের মাঝখান দিয়ে গেছে ছোট সরু পথ। তাই ধরে অগ্রসর হচ্ছেন

গুরু নানক। তিনি চলেছেন আর সঙ্গী যোগীবরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, যোগীবর, এবার আপনি বুঝতে পারবেন, আমার শিষ্যরা কতখানি আমার প্রতি অনুরক্ত।

বনে প্রবেশ করার আগে নানক সকলকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নেন এই বলে যে যতক্ষণ বন-ভ্রমণ চলবে ততক্ষণ কেউ সঙ্গে টাকা পয়সা রাখতে পারবে না। সকলে নানকের কথায় রাজী হলো। এবার শুরু হলো নির্বিঘ্নে পথ চলা। কিছুদূর যাবার পর পথের ধারে দেখা গেল অপূর্ব দৃশ্য। বনের মধ্যে পথের কাছাকাছি ছড়ানো রয়েছে অজস্র তাম্রমুদ্রা। ঐ দৃশ্য দেখার পর যোগীবর বললেন নানককে, বুঝেছি, এসব হচ্ছে আপনার অপূর্ব সিদ্ধির খেলা। তা নাহলে এই বনে হঠাৎ এত তামার মুদ্রা এলো কি ভাবে?

যোগীবরের কথা শুনে সামান্য হাসলেন নানক। তারপর তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, আপনার অনুমান ঠিক। আমার শিষ্যদের মনোভাব পরীক্ষা করার জন্যে আমাকে এমনি ধারা কাজ করতে হয়েছে, আপনি চুপ করে পথ দিয়ে চলুন। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। আপনি কেবল ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখুন।

নানক তাঁর অন্তরঙ্গদের নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক শিষ্য সামান্য পিছিয়ে সরে এলো। তারা অলক্ষ্যে ঝুলিতে কিছু তাম্রমুদ্রা ভরে নিল। তারপর তারা সরে পড়লো। এবার নানক এলেন এমন এক জায়গায় যেখানে ছড়ানো রয়েছে রুপোর টাকা। এবার একদল শিষ্য সেই টাকার স্তূপ হতে কিছু টাকা ঝুলির মধ্যে পুরে সরে পড়লো অন্যত্র। গুরু নানক ও তাঁর প্রিয় সঙ্গী যোগীবর দেখলেন ঐ দৃশ্য। দু'জনে দু'জনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর তাঁরা এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।

চলতে চলতে তাঁরা হঠাৎ এলেন এক জায়গায়। এখানে দেখলেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। এখানে রুপোর টাকা নয়, সোনার টাকা ছড়ানো রয়েছে। সে হচ্ছে রাশি রাশি টাকা।

সেই টাকা হতে কিছু অংশ সরিয়ে ঝুলির মধ্যে ভরতে লাগলো অনেকে। তারপর গুরুজীর দল থেকে বেশ কিছু অংশ সরে পড়লো। এবার নানক সামান্য কয়েকজন শিষ্যদের নিয়ে এগিয়ে চললেন।

পথে চলার সময় গুরুজী অবশিষ্ট গুটিকয়েক শিষ্যদের দেখে বললেন, ঈশ্বরের কৃপায় তোমরাই হলে আমার প্রকৃত আপনজন। এবার তোমাদের সামনে

আসছে এক কঠোর পরীক্ষা! ধৈর্যের সঙ্গে তোমাদের এই পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হতে হবে। আশাকরি তোমরা এই পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হতে পারবে।

কিছুদূর আসার পরই তাঁরা দেখতে পেলেন সামনে রয়েছে একটি শব। শবের সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা।

সকলে ভাবলো, কারা হয়তো এই শবকে দাহ করতে এনেছিল। কোন হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। শব দাহ করা হয়নি। শবটি গলিত। তার শরীর থেকে উৎকট দুর্গন্ধ বেরচ্ছে।

কাপড়ে ঢাকা শবের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে নানক তাঁর অন্তরঙ্গদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে এই শবের মাংস খেতে পারবে?

গুরুজীর এমন ধরণের কথা শুনে উপস্থিত শিষ্যরা হতবুদ্ধি হতবাক হয়ে গেল। তারা ভাবলে, গুরুজী একি ধরণের কথা বলছেন? পচা ও গলিত শবের মাংস খেতে বলছেন কেন? তবে কি ওঁর মাথা খারাপ হয়েছে? তাই উনি এমন অসঙ্গত প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।

উপস্থিত শিষ্যগণ গুরুজীর কথার তাৎপর্য খুঁজতে লাগলো। তারা নতমুখে চিন্তা করতে লাগলো পরবর্তী কালের কথা।

এমন সময় যোগীবর বললেন গুরুজীকে উদ্দেশ্য করে, নানকজী, আপনার এই আদেশটা অত্যন্ত কড়া বলে মনে হচ্ছে। আপনার জন্যে যে সব একনিষ্ঠ ভক্ত প্রাণ দিতে কুন্ঠা বোধ করে না তারাও এ ধরণের ন্যক্কারজনক কাজ করতে ইতস্তত করবে বৈকি!

যোগীবরের কথা শুনে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন নানক, যোগীবর, ধর্মের জন্যে যারা সর্বস্ব ত্যাগ করেছে তারাই হচ্ছে প্রকৃত শিখ। বিশেষ করে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় এই তিনটিকে আগে ত্যাগ করতে হবে। এগুলিকে ত্যাগ না করলে পরমকে তো পাওয়া যাবে না। যারা আমার প্রকৃত ভক্ত তাদের যথার্থভাবে পরীক্ষা করবার জন্যে আমি প্রস্তাব করেছি। আমি এই আদেশ আর ফিরিয়ে নিতে রাজী নই।

গুরু নানকের একনিষ্ঠ শিষ্য লহিনা অদূরে দাঁড়িয়ে এসব কথা শুনছিল। সে অমনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে গুরুজীকে নমস্কার করে বললে, গুরুজী, এ দীন ভক্ত আপনার আদেশ পালন করতে সর্বদাই প্রস্তুত। আপনি বলুন এই শবদেহের কোন দিকটা খেতে হবে? আগে মাথার দিক না আগে পায়ের দিক?

ভক্ত লহিনার পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা অধীর হয়ে উঠলো। ভাবলো, লহিনা কি শেষে পাগল হয়ে গেল? কিন্তু লহিনা নীরবে গুরুর পরবর্তী আদেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। গুরুজী এবার আদেশ করলেন, বৎস লহিনা, মৃতদেহের মাঝখান থেকে অর্থাৎ কোমর থেকেই তুমি খেতে শুরু করো।

গুরুর আদেশ পাওয়া মাত্র ভক্ত পূতিগন্ধময় মৃতদেহের কোমরের কাছে কামড় দিলো। দেখতে দেখতে ঘটে গেল এক অসম্ভব কান্ড। সেই গলিত শব পরিণত হলো এক অপূর্ব ভোজ্য দ্রব্যে।

পরে শবের ওপর কাপড়টা সরানো হলো। সকলে দেখলে, সেখানে আর শব নেই। তার পরিবর্তে থরে থরে সাজানো রয়েছে লোভনীয় ভোজ্য দ্রব্য। উপস্থিত সকলে ঐ দৃশ্য দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল।

অতঃপর গুরুজী তাঁর প্রিয় ভক্ত লহিনাকে কাছে ডেকে পরম স্নেহভরে বলতে লাগলেন, ভক্ত লহিনা, আজ তুমি হলে প্রকৃত শিখ। আমার পরীক্ষায় তুমি যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হয়েছ। এবার তুমি পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপালাভ করার যোগ্য হয়ে উঠেছ। গুরুর প্রতি শরণাগত হয়ে নিয়মিত নিষ্ঠাসহকারে সাধনভজন করো। তাহলে অচিরে তুমি লাভ করবে পরম প্রেমময় সেই ঈশ্বরকে।

যোগীবরও ভক্ত লহিনার অসম্ভব গুরুভক্তি এবং গুরুগত-প্রাণ লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন। তিনি উচ্চকন্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন নানকভক্ত লহিনাকে। পরবর্তীকালে এই লহিনাই হয়ে ওঠেন দ্বিতীয় শিখগুরুরূপে মহামান্য ও পরম সিদ্ধ সাধক অঙ্গদ।

ভক্ত অঙ্গদকে উপলক্ষ্য করে শিখগুরু নানকের বহু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হয়েছে।

সেবার ভক্ত অঙ্গদ কর্তারপুরে গুরুর আশ্রম অভিমুখে চলেছেন। আজকাল আশ্রমে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বেশ ভীড় হয়। তাদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হয় নানকজীর শিষ্যদের।

ভক্ত অঙ্গদ যেদিন গুরুজীর আশ্রমে এলেন, সেদিন বহু দর্শনার্থী এসেছেন গুরুজীকে দেখতে। আর সেদিন আকাশে দুর্যোগও লেগেছে। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ওদিকে রাধা নদীর বন্যায় নদীর দুকূল ডুবে গেছে। আশ্রমে মজুত করা খাদ্যদ্রব্যও ফুরিয়ে গেছে। এই দুর্যোগের সময় বাইরে থেকে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা যাচ্ছে না।

অথচ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে অগণিত অতিথি। তাদের খাওয়ানোর ভার রয়েছে আশ্রমবাসী শিষ্য ও ভক্তদের ওপর।

তারা নিরুপায় হয়ে গুরু নানকের শরণাপন্ন হলো। বাইরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এককণা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারলো না।

এই সঙ্কটকে উপলক্ষ করে গুরু নানকের অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ আর একবার ঘটলো।

গুরুজী এতক্ষণ ধ্যানাসনে বসে ছিলেন নিজের সাধন কুটিরে । কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন। অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন আশ্রম সংলগ্ন বাগানে।

একটা কীকড় গাছের নীচে এসে অঙ্গদকে আদেশ করলেন, বৎস, এর শাখায় উঠে খুব জোরে ঝাঁকুনি দাও তো। তোমাদের সকলের উপযোগী খাদ্য এখান থেকেই পাবে।

গুরুজীর কথা শুনে সকলে হতবাক হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবলো, এ কি বলছেন গুরুজী! একটা গাছ আমাদের খাদ্য জোগাবে। এও কি সম্ভব?

গুরুজীর পুত্র শ্রীচাঁদ বলে উঠলো, কীকড় গাছের শাখা-প্রশাখা কাঁটায় ভরা। এর ফল তেঁতো ও অখাদ্য। এই গাছ থেকে সুস্বাদু কিছু পাওয়া যায় এমন অদ্ভুত কথা তো কখনো শোনা যায় নি।

পুত্রের কথা শুনে গুরু নানক জলদগম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, বৎস, এতদিন যা শোনো নি আজ তাই শোনো। আজ এখানে দাঁড়িয়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করো, ভক্তের সঙ্কট হলে, সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকলে নিশ্চয়ই ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, ভক্তবীর অঙ্গদ আজ তোমাদের সকলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।

গুরুর ইঙ্গিতমত ভক্ত অঙ্গদ উঠে পড়ল কীকড় গাছে। জোরে জোরে ডাল-পালা নাড়াতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে পড়তে লাগলো প্রচুর সুস্বাদু ফল ও মিষ্টান্ন।

ঐ দৃশ্য দেখে নানকের অন্তরঙ্গ শিষ্যরা অবাক হলো। তাঁরা এক সঙ্গে গুরুজীর অপার মহিমা অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করে জয় ধ্বনি করতে লাগলো।

DO NOT COPY

না বলতে নেই

শ্রী দীপঙ্কর নন্দী

মুখের উপর না বলতে নেই
কাকে যে কখন দরকার পড়ে –
আমরা সবাই কারও না কারোর
কাছে কোন না কোন কারণে ঋণী
সেটা আমরা নিজেরাও কি জানি?

মুখের উপর না বলতে নেই –
বিপদে পড়লে কার যে কখন
কাকে দরকার পড়ে কে বলতে পারে!
মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হয় –
কথাবার্তা বুঝেশুনে বলতে হয়।

মুখের উপর না বলতে নেই –
কে যে কখন কোন কথায়
আঘাত পাবে বা রেগে যাবে
তা কি কেউ বলতে পারে?
কাউকে তাই চটাতে নেই।

মুখের উপর না বলতে নেই –
এখন ভালো আছি, কাল
ভালো নাও থাকতে পারি –
কারোর বাড়ি হঠাৎ করে
না বলে কয়ে যেতে নেই –
অকারণে কথা বলতে নেই।

মুখের উপর না বলতে নেই –
সব কথাতে কথা বলতে নেই
আগ বাড়িয়ে কথা বলতে নেই
কথার খই ফোটাতে নেই

DO NOT COPY

বোবার কোন শত্রু নেই

মুখের উপর না বলতে নেই –
হাল্কা হাসি ঝুলিয়ে রেখে
কথায় কথায় হাসতে নেই –
আপনি যে পিঠ সোজা রেখে
নিজের মতন বাঁচতে জানেন
সেটা বুঝতে দিতে নেই।

মুখের উপর না বলতে নেই –
না কথাটা জেনেবুঝে মুখের উপর
কস্মিনকালেও বলতে নেই।

এবার দাঁড়াতে দাও **শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য**

বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরের দিকে
পিঠ করে বসে আছি ---
সামনে ঝাউ গাছগুলো
মাথায় সোনার মুকুট পরে
বিজয়ী বীরের মত দাঁড়িয়ে
যেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর!

সাগরের দুর্বার ঢেউ ওদের
ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়, পারে না
প্রতিবার ততোধিক শক্তি দিয়ে আঘাত করে
প্রতিবার টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে
দৃঢ়তার কাছে চঞ্চলের হার হয়!

পদতলে লুটিয়ে পড়ে বলে ঢেউগুলি
ক্ষমা করো, বাঁচাও আমাদের

DO NOT COPY

মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে আর পারিনে,
ছড়িয়ে পড়া টুকরোগুলো এক করো
এবার দাঁড়াতে দাও।

খেলার সাথী **শ্রীলা মৈত্র**

খেলতে এসে ডেকেছিলে কাছে।
তারপর
বিকেল না শেষ হতে
খেলা ফেলে চলে গেলে
দরজাটা বন্ধ করে।
কতবার বন্ধ দরজায়
আঘাত করেছি।
আবার খেলতে এসো
বলে অনুনয় করেছি
তুমি শুনতে পাওনি।
এখন চুপ করে বসে আছি
কখন তুমি ডাকবে আমায়
তোমার আপন খেলা ঘরে।

DO NOT COPY